Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501029

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

An Exploration of Polyphony in Tarasankar Bandyopadhyay's Novels

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বহুস্বরের অনুসন্ধান

Pritha Sarkar
Teacher
Hooghly

Received on: 25th April 2026
Accepted on: 10th May 2026

Abstract:
Tarasankar Bandyopadhyay's novels stand out for their unique indigenous style, capturing the deep realities of rural Bengal. His work is a celebration of "Polyphony", where marginalized characters speak in their own natural voices rather than acting as echoes of the author. This use of "Heteroglossia" brings diverse social languages and regional dialects into the heart of literature. Instead of following fixed Western rules, his narrators often adopt traditional oral forms like Panchali, shifting their perspectives to suit the story. By using myths, folk songs, and proverbs, Tarasankar creates a "Carnival" atmosphere that allows common people to express their desires and challenge social hierarchies. His mastery of the "Chronotope" effectively portrays the historical transition of village life into a modern era. What some viewed as a "loose" structure was actually a deliberate and modern artistic choice to mirror the complexity of life. Ultimately, his narrative innovation provides a different and profound understanding of humanity. This multifaceted approach makes his work a timeless and unique contribution to Bengali literature.

Key Words:
Indigenous style, polyphony, carnival, folk elements, narrator, chronotope, monologic.

মূল প্রবন্ধ

তারাশঙ্করের জীবদ্দশায় তাঁর সাহিত্য কীর্তি নিয়ে বহু সমালোচনা হয়। সেই সমালোচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তার অনেকটাই ছিল তাঁর উপন্যাসের গঠনশৈলীর উপর, কারণ গতানুগতিক পাশ্চাত্য রীতির নিয়ম মেনে তিনি উপন্যাস নির্মাণ করেন নি অনেক ক্ষেত্রেই, কিন্তু এও তো ঠিক, পাশ্চাত্যের সাহিত্য বিচারই, সাহিত্য বিচারের একমাত্র প্রতিমান হতে পারে না। তাঁর বিরুদ্ধে মূল সমালোচনা ছিল — তিনি নাকি লিখতে জানতেন না। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'An Acre of Green Grass' বইতে লেখেন, "Tarasankar has a lot to write about, but does not seem to know how to write."[১] — অর্থাৎ তারাশঙ্করের উপন্যাসে লেখবার উপকরণ অনেক ছিল, কিন্তু তিনি জানতেন না কীভাবে তা লিখতে হবে। এই বইতেই আরো বলা হয় — "he observes, but cannot judge, he visualizes well, but has no vision."[২] — কিন্তু প্রশ্ন একটাই, এটা একজন লেখকের সাহিত্য সৃষ্টির নিজস্ব ধরন হতে পারে, উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধির ত্রুটি হিসাবে কেন ধরা হচ্ছে? তাহলে কী উপন্যাসের শিল্পরূপ কেমন হবে তা পূর্ব নির্ধারিত বলেই আমরা ধরে নিচ্ছি!

সমালোচক হিরণকুমার সান্যাল 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' সম্পর্কে বলেছেন, "এই উপন্যাসের আসল রচয়িতা কাহার পাড়ার

© Santiniketan Sahityapath

বুড়া-বুড়ী, যুবক যুবতী; বাঁশঝাড়ের আধা-অন্ধকারে এদের জমে মদের নেশা — স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে, আর জমে 'রং' — মনের সঙ্গে মনের, পুরুষের সঙ্গে নারীর এবং এর স্বামীর সঙ্গে ওর স্ত্রীর, আর সেই সঙ্গে অদল-বদল হয় সামাজিক সম্বন্ধ।... হাঁসুলীবাঁকের উপকথা একেবারে ভানুমতির ভেলকি।"[৩] পৌষ ১৩৫৪, 'পরিচয়' পত্রিকায় এই সমালোচনার পাঁচ বছর পর, ওই পত্রিকাতেই সমালোচক ননী ভৌমিক প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেন, 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো পাতার পর পাতা জুড়ে তথাকথিত কাহার নরনারীর 'রঙ ঢং' ও টুকরো উপকথার বর্ণনা। এর ফলে এই উপন্যাসের পাঠক এমন এক কৃত্রিম উপকথার রাজ্যে গিয়ে হাজির হয়, যা বাস্তবের প্রতিফলন নয়... "সংগ্রামের সঠিক প্রতিচ্ছবি এই উপকথার রাজ্য থেকে বহিস্কৃত।"[৪] কিন্তু সমালোচনার অন্য অভিমুখও দেখা যায়, যা ইতিবাচক — বিষ্ণু দে 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক' বইতে বলেন — "তারাশঙ্করবাবুর কাঠামোর ব্যাপ্তি আমাকে অভিভূত করে,...।... প্রত্যক্ষ জীবন, ভূগোল, ইতিহাস বিশিষ্ট যে বাস্তব জীবন, তারাশঙ্করের প্রতিভায় বাংলা উপন্যাসে তা আগন্তুক। এবং এমনি গভীর তার সংবেদন যে প্রাকৃত ভাষা তাঁর হাতে ছন্দের নির্ঝর হয়ে উঠেছে...। এটা যে কি মূল্যবান কীর্তি, তা ইউরোপের উপন্যাসের ইতিহাস দেখলে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হবে; তাছাড়া সত্যকার ঔপন্যাসিক সার্থকতা তো এখানেই — প্রত্যক্ষ জীবনের স্থানকাল নির্ণীত রূপায়ণে, যে রূপায়ণের চরম প্রাণপরীক্ষা ঐ ছন্দউৎসারের সততায়।"[৫]

'বৈশাখী' পত্রিকা তারাশঙ্কর সংখ্যায় অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সমালোচনা-প্রতিসমালোচনা ও তারাশঙ্কর-উপন্যাসের বিকল্প প্রতিমান' প্রবন্ধে জানান — "মনে হতে পারে, 'মার্কসবাদী সাহিত্য' বলে 'উর্দিপরা কোনও সাহিত্য' হয় না — এই বিশ্বাসে আস্থিত বিষ্ণু দে-র তারাশঙ্কর-প্রশংসা এখানে বলগাহীন, মুখর। কিন্তু পশ্চিমী উপন্যাসের উল্লেখসূত্রে তিনি যেন এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে পশ্চিমেও উপন্যাসের কোনও একটিমাত্র প্রতিমানকেই অনন্য মনে করার কোনও হেতু নেই। অন্তত সেইসময় বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র পরিচয়ের কোন সুযোগ হওয়ার কথা নয়। অথচ 'কাঠামোর ব্যাপ্তি', 'সেতারের রাগমালা'-র উল্লেখে বিষ্ণু দে যেন বাখতিনকথিত বহুস্বরিকতা নামক উপন্যাসের অমোঘ অভিজ্ঞানের দিকেই তর্জনী সংকেত করেছিলেন সেই ১৩৫৪-র শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকার প্রবন্ধটিতে।"[৬]

তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্য জীবন' বইতে নিজেই জানান — "আমার পাত্র-পাত্রীর মুখে আমার ভাষার কথা আমি বসাতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনায় রচনায় বেরিয়ে আসে।[৭] লেখক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য তাঁর 'আখ্যান ও সমাজ তারাশঙ্কর' বইতে 'কবি'র কথায় নামক আলোচনায় — এই বক্তব্যটি উল্লেখ করে বলেন — " 'কবি' উপন্যাসের ভাষা নিয়ে যখন ভাবি, তখন তারাশঙ্করের এই উক্তির সারবত্তা টের পাই। নিতাই রাজা বিপ্রপদ ঠাকুরঝি বসন মোহন্ত — সমস্ত মুখ্য আর গৌণ চরিত্র- নিজের নিজের জবানিতে কথা বলে ওঠে কারো ভাষাই লেখকের ভাষার প্রতিধ্বনি নয়...। হয়তো এই কারণে কবি'তে আমরা বহু স্বর শুনতে পাই; শুধুই লেখকের কণ্ঠস্বর নয়।"[৮] সুতরাং একথা বলাই যায় কিছু সমালোচকের দৃষ্টিতে তারাশঙ্করের উপন্যাসের যে দিকগুলি দুর্বলতা বলে সাব্যস্ত হয়েছে, কিছু সমালোচকের বিচারে সেগুলিই তাঁর সাহিত্যের বড়ো গুণ বলে বিবেচিত হয়েছে। এই সমালোচনার সূত্র ধরেই তাঁর উপন্যাসের নিজস্ব শৈলীর অনুসন্ধান করলে সেখানে বহুস্বর, কার্নিভাল, ক্রনোটপের মতো ধারণার সঙ্গে তাঁর উপন্যাসগুলিকে মিলিয়ে দেখতে পারব।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উপন্যাসেও, কী বলা হলো তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কীভাবে তা বলা হলো — 'কী বলা হল' কে বলা যায় Content, আর 'কীভাবে বলা হল' হচ্ছে তার Form। কীভাবে বলা হলো এর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা উপন্যাসের প্লট, কথনরীতি ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি, সেখান থেকেই আসে কথকের ধারণা, যে-কোনো উপন্যাসে কেবলমাত্র কথকের স্বর বা নির্মাতা লেখকের স্বরকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না, তার সঙ্গে নানা রকম চরিত্রের স্বরও প্রাধান্য পায়। সুতরাং বলা যায় উপন্যাস আখ্যান একসঙ্গে বহু স্বরকে ধারণ করে। এই বহুস্বরের ধারণাটি আমরা পাই রাশিয়ান ভাষাতাত্ত্বিক ও শৈলী বিচারক মিখাইল মিখালোভিচ বাখতিনের সাহিত্য তত্ত্বে।

বহুস্বরের প্রায়োগিক আলোচনায় আমি তারাশঙ্করের আখ্যান বিশ্বকে নির্বাচন করতে চাই, কারণ তারাশঙ্কর প্রায় কল্লোল সমসাময়িককালে সাহিত্য রচনা করেও, পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত হননি; তাঁর রচনায় দেশজ মনের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়। তার বিরুদ্ধে সমালোচকদের অভিযোগ ছিল তাঁর রচনায় ভাষা অত্যন্ত আটপৌরে ও দুর্বল। তারাশঙ্কর নিজেই জানান, "আমার পাত্র-পাত্রীর

মুখে আমার ভাষার কথা আমি বসাতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনায় রচনায় বেরিয়ে আসে।" সুতরাং বাখতিন কথিত পলিফোনিক ধারণায় অনুসন্ধান করলে দেখা যায় কীভাবে লিখতে হবে অর্থাৎ ফর্ম-এর নিজস্ব ধরন তারাশঙ্করের রচনায় বর্তমান তা হয়তো পাশ্চাত্যের ধরনের থেকে আলাদা। তাঁর রচনায় বিভিন্ন চরিত্রগুলি তাদের নিজস্ব অবস্থান বর্গ থেকে তাদের বক্তব্য রাখেন, পাশাপাশি কথক চরিত্রের গুরুত্ব অনেক এইভাবে বিভিন্ন স্বর ও স্বরের সমবায়ে, উপন্যাসগুলি সার্থক শিল্পরূপ হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর বাখতিন পড়েন নি একথা ঠিক, তাঁর রচনায় দেশজ মনের উপস্থিতি, তাহলে মিখাইল বাখতিন এর মতো পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকের আখ্যান তত্ত্বের আলোকে তাঁর উপন্যাসের পুনর্বিবেচনা কেন? তারাশঙ্কর নাকি লিখতে জানতেন না, তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, তাঁর রচনার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে, দস্তয়েভস্কির রচনাতেও দেখি, লেখক এমন করে উপন্যাস নির্মাণ করেন, যেখানে লেখক চরিত্রগুলিকে যেন শুধু দেখেন, কখনো বিচারকের আসনগ্রহণ করেন না। নিজস্ব অভিমত বা অভিপ্রায় চাপিয়ে দেন না, তারাশঙ্করের গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে দেখি কথনরীতি, চরিত্র নির্মাণ, গান প্রবাদ-প্রবচন, সব নিয়ে তিনি যেন দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাই বলা যায় তার রচনা শিথিলতার যে অভিযোগ আছে, সেই শিথিল প্লট শিল্পের নতুন দিকে নির্দেশ করে।

কথকের স্বর:

তারাশঙ্করের গ্রামজীবন নির্ভর উপন্যাসের আখ্যানগুলি আধুনিক পাঠকের দৃষ্টিতে ভিন্ন উপলব্ধি নিয়ে আসে। উপন্যাসের কথক উপন্যাসের এক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বর বলা যেতে পারে যার বয়ানে আমরা উপন্যাসের প্লট সময় স্থান চরিত্রের বর্ণনা অনেক কিছুই পেয়ে থাকি। তারাশঙ্করের উপন্যাসের দেশীয় কাঠামোয় আখ্যানের কথক আমাদের সামনে কথকতা করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাঁচালী মঙ্গালকাব্যে ব্রত কথায় এই কথকতার ধরন প্রচলিত ছিল যাকে সমালোচক দেবেশ রায় বাখতিন অনুসরণে আখ্যান সাহিত্যের অন্তর্গত ঔপন্যাসিক বিবরণ হিসেবে চিনে নিতে চান। 'In problem of Dostoevesky's poetics' (1929) বইতে বাখতিন উপন্যাসের দুটো ধরন দেখান — monologic হলো সেই রচনাগুলি যেগুলিতে লেখকের বাচন বা Authoritative Discourse অন্য সব চরিত্রের বাচনকে অধীনে রাখে, লেখকের একক কণ্ঠস্বর সেখানে প্রাধান্য পায়। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে কোনো সাহিত্যিক নির্মাণই সম্পূর্ণ monologic নয়। কিন্তু যে সব রচনায় চরিত্রের একক স্বরগুলি রচনাকারের উদ্দেশ্যের অধীন হয়ে পড়ে সেগুলিতে কেবল একটি স্বরের সত্যতা থেকে যায় — যা লেখকের নিজের।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) নামকরণের মধ্যেই সাবেক কালের গল্পকথার আভাস পাই। এখানে সুচাঁদ যে কথক রূপে ন্যারেটিভের নির্মাণ করে বা 'নাগিনী কন্যা'র কাহিনিতে ব্রত কথার সূত্রে শবলা, পিঙ্গালার কথা, 'গণদেবতা'এ প্রবীণ ন্যায়রত্ন সুচাঁদের মতোই পুরাকালের কথাগুলি জিইয়ে রাখতে চায়। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে কথক শুরুতে বক্তার আসনে থাকলেও, পরে শ্রোতার আসন গ্রহণ করেন। কথক তখন প্রাচীন কবিরাজ শিষ্য শিবরাম সেন অর্থাৎ নিরীক্ষণ বিন্দু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আমরা বারবার কথকের বদল হতে দেখি। উপন্যাসের শুরুতে লেখকই যেন কথক আমাদের জানাচ্ছেন, "কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক — অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গহনার মত।"[৯] আবার উপন্যাস অল্প কিছুদূর এগোতেই দেখি কথকের বদল ঘটেছে, সুচাঁদ বুড়ি হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বলে। "সেই থমথমে মজলিসে সুচাঁদ আবার আরম্ভ করলে — এই বাবার দয়াতেই হাঁসুলী বাঁকের যা কিছু। ওই চৌধুরীরা তিন পুরুষ আগে তখন গেরস্ত, সাহেবদের নীলকুঠির গোমস্তা...। সেবার এল কোপাইয়ের 'পেলয়' বান। সে অনেক দিন আগে, তখন আমরা হই নাই, বাবার কাছে গল্প শুনেছি।"[১০]

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসেও দেখি বারংবার কথক এর ভূমিকা বদল ঘটেছে। উপন্যাসের শুরুতেই কথক আমাদের জানান, "মা ভাগীরথীর কূলে কূলে চর ভূমিতে ঝাউবন আর ঘাসবন, তারই মধ্যে মধ্যে বড় বড় দেবদারু গাছ।... হিজল বিলের ডাক শুধু গন্ধেরই নয় — শব্দেরও আছে।"[১১] উপন্যাস কিছুদূর অগ্রসর হতেই কথক শিবরাম কবিরাজ, তখন তার নিরীক্ষণকে ব্যবহার করা হয় উপন্যাসে, "শিবরাম অবাক হয়ে দেখছিলেন মেয়েটিকে। চিনতে দেরি হয় নাই এই মেয়ে সাপুড়েদের মেয়ে বেদেনী। কিন্তু এ বেদিনী আগের দেখার সব বেদিনী থেকে আলাদা। চেহারাতে আলাদা, কথায় আলাদা, সাজে পোশাকে আলাদা"[১২]

গোষ্ঠী জীবনের /লোকায়ত স্বর:

© Santiniketan Sahityapath

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে লেখা উপন্যাসে লেখকের ভাষা জগৎ আর জনগোষ্ঠীর ভাষা জগৎ এক হয় না। কিন্তু পাঠকদের সম্ভবত অধিকাংশই মান্য ভাষারীতিতে অভ্যস্ত। তাই লেখক একইসঙ্গে ভাষার একাধিক স্তর বুনে দেন উপন্যাসের অবয়বে, বর্ণনার ভাষা মান্য চলিত। কিন্তু সংলাপের ভাষা কোনো উপভাষা। গোষ্ঠী জীবনকে দেখতে চাইলে উপভাষা ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই উপভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে লোকায়ত চরিত্রগুলি নিজেদের স্বরকে নির্মাণ করেন। আবার কখনো দেখা যায় কথকের কণ্ঠস্বর আর চরিত্রের কণ্ঠস্বর মিশে যায় যার ফলে দ্বিস্বর পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু শুধু এই দ্বিস্বর পরিস্থিতি নয়, নানা চরিত্র, নানা অবস্থান নানা সংঘাতের মধ্যদিয়ে উপন্যাসে বাখতিন কথিত বহুস্বরিক পরিস্থিতি তৈরি হয়।[১৩] শুধু উপভাষা নয়, প্রবাদ-প্রবচন নিজস্ব উচ্চারণ রীতি ইত্যাদির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লোকায়ত চরিত্রগুলি নিজস্ব স্বরকে নির্মাণ করে। চরিত্রের কণ্ঠস্বরের দৃষ্টান্ত — "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা সবচেয়ে বেশি জানে সুচাঁদ। সে বলে, বনোয়ারি বাবার বাবার বাবা আর আমার বাবা এক নোক তো। তা আমার কথা বাবা আমার পেথম কত্তামাকে শীল নোড়ার নোড়ায় মাথা ছেঁচে মেরেছিল বুকে বসে, নোড়া দিয়ে।"[১৪]

নারীর স্বর

গোষ্ঠী জীবনে নারী চরিত্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তারাই কৌমজীবনের মূল শক্তি। যে-কোনো কৌমজীবনের মূল ধারক ও বাহক এই নারীগুলি। তাই গোষ্ঠী জীবনে সংস্কৃতির রক্ষার মধ্যে দিয়ে এই নারী চরিত্রগুলি আখ্যানে নিজস্ব কণ্ঠস্বরকে বজায় রাখে। 'গণদেবতা' উপন্যাসের দুর্গা, কিংবা কবি উপন্যাসের বসন প্রকৃতপক্ষে দেহোপজীবিনী হয়েও, তাদের নিজের আত্মগোষ্ঠী রক্ষায় এগিয়ে আসার প্রবণতা চরিত্রায়নে তৈরি হয় স্বতন্ত্র এক প্যাটার্ন। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় দুর্গাকে ডোম বলে স্বৈরিণী বলে নিজের চোখে দেখতে পারেন নি। দুর্গাকে দুর্গা রেখেই তিনি মহিমা দিতে চেয়েছেন। বাখতিন তাঁর সাহিত্যের ব্যাখ্যায় জানান polyphony সূত্র ধরে এসে পরে Heteroglossia প্রসঙ্গ। যেখানে বলা হয় ভিন্ন গোত্রীয় অস্তিতের প্রেক্ষিতে রেখে না দেখলে কোনো দেখাই সম্পূর্ণ নয়। জগত ও জীবনকে দেখার জন্য চাই ভিন্ন মেরুর অবস্থান — যা আনে অপরতার উপলব্ধি, এই ভাবেই সাহিত্যে আধিপত্যবাদী বর্গের বিপরীতে তৈরি হয়েছে নিম্নবর্গ, কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিপরীতে নারীবাদী স্বর। দ্বি-বাচনিকতা বা dialogism ভাষার একটি বিশেষ গুণ- যেখানে একটি উচ্চারণের মধ্যে নিহিত থাকতে পারে অন্য কোনো উচ্চারণ — কখনো প্রকট ভাবে, কখনো প্রচ্ছন্ন ভাবে রূপক বা ব্যঙ্গ এর মধ্যে। এর ফলে সংলাপের নানা পরিসর তৈরি হয়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানো যেতে পারে অনিরুদ্ধ'র দৃষ্টিতে দুর্গা কি রকম ছিল — "সেই দুর্যোগের মধ্যে দুর্গা আসিয়া দাঁড়াইল মোহিনীর বেশে; শুধু মোহিনী রূপ লইয়াই অফুরন্ত ভালোবাসাও দিয়াছিল দুর্গা। সেবা যত্ন — এমন কি নিজের পার্থিব সম্পদও সে তখন অনিরুদ্ধের জন্য ঢালিয়ে দিতে চাহিয়াছিল, কিছু দিয়াছেও।"[১৫] এখানে একাধারে লেখকের অভিপ্রায়, ও অনিরুদ্ধের মনোভাবের মধ্য দিয়ে দুর্গা চরিত্র পাঠকের সামনে ধরা দিল। এই ভাবেই কথকের কণ্ঠস্বর ও চরিত্রের কণ্ঠস্বর মিলে দিস্বর পরিস্থিতি তৈরি হয়। আবার কথক রূপে লেখক যেন আমাদের জানান, "দুর্গার মধ্যে আগুন ও জল দুই-ই আছে, একাধারে জ্বলিবার ও জুড়াইবার উপাদান। তাহার যৌবনে আছে আবেগময়ী মানবীয় ঈষদুষ্ণ স্বাদ;- তাহা অনিরুদ্ধকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ভালবাসায় আছে সর্বস্ব ঢালিয়া দিবার আকুতি।"[১৬]

সংগীত-স্বরের বিকল্প নির্মাণ:

লোকায়ত উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট উপাদান হিসাবে গান বহুজনের স্বরকে ধারণ করে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে গান এসেছে পরিস্থিতি রচনায়, চরিত্র সৃজনে, কৌতুক, মধুর রসের বিস্তারে। 'রাইকমল' উপন্যাসে উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ রসিক দাস বাউল বৈষ্ণবের আবির্ভাব মুহূর্তে তার কণ্ঠের গান — 'মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলিতে'[১৭] গানটির মধ্য দিয়ে বন্ধনহীন বাউল রসিকদের লক্ষ্যভ্রষ্ট পথভ্রান্তির বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। এই ভাবে গানটি উপন্যাসে স্বতন্ত্র এক স্বরকে নির্মাণ করেছে।

'কবি' উপন্যাসে প্রথম পর্যায়ে অট্টহাসে চামুণ্ডার মেলায় প্রতিষ্ঠিত কবিয়াল মহাদেব পালের প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত থাকায় আসরে গান গায় নিতাই। সেখানে ছোকরারা নিতাইকে নিয়ে ব্যঙ্গ করলে নিতাই তার পুরাণ জ্ঞানের পরিচয় দেয় এই গানের মধ্য দিয়েই। সেখানে তার বুদ্ধিদীপ্ত প্রত্যুত্তর গানের মধ্য দিয়ে সে পরিবেশন করে যা সমস্ত আসরকে স্তব্ধ করে দেয়। আবার তার প্রতিপক্ষ কবিয়াল মহাদেব পালও নিতাইয়ের বংশ পরিচয় কটাক্ষ করে এই গানের মধ্য দিয়েই। এইভাবে গান উপন্যাসে বিকল্প বয়ান হয়ে উঠছে।

© Santiniketan Sahityapath

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে ছোটো-বড়ো মোট চব্বিশটি গান আছে। এদের মধ্যে লোকসংগীতের গান বেশি, যেমন ফকিরি গান ঘেঁটু গান, কথকতাধর্মী গান, ছড়া ইত্যাদি। তারাশঙ্করের কবি কল্পনা সবচেয়ে বেশি স্ফূর্তি লাভ করে প্রেমের গানগুলিতে, ঝুমুর ধরনের এই গানগুলিতে চিত্রকল্পের সৌন্দর্য চমৎকার, এখানে ছোটো-বড়ো দুই রকমই গান আছে যেমন পাগলের কণ্ঠে ছোটো একটি প্রেমের গান, "প্রেমে পাগল হলাম আমি প্রেমের নেশা ছুটল না / হায় সখি গো সজনে হল, ঝিঙের ফুল কই ফুটল না।"[১৮]

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়' তারাশঙ্কর ইতিহাস দ্রষ্টা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর গ্রামীণ সমাজের ভাঙন ও পরিবর্তনের কথাকার। বন্যা ও যুদ্ধপ্রস্তুতি প্রয়োজনে বাঁশবাদি গ্রামের বাঁশঝাড় নির্মূল হয়েছে। গ্রামের কাহার ও কৃষকরা করালীর নেতৃত্বে গ্রাম ছেড়ে চন্দনপুরের রেললাইনে মজুর হয়েছে। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি ভাঙছে নতুন কালের শ্রম অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনকে তারাশঙ্কর ব্যথিত স্রষ্টার মত ব্যক্ত করেছেন উপন্যাসের অন্তিম পর্বে, পাগলের পাঁচালী ভঙ্গিমা গানে।

বাঁশের বেড়া বাঁশের ঝাঁপি তাহারই ভিতর
কাহার কুলের পরাণ ভ্রমর বেঁধে ছিল ঘর।
বাঁশের বেড়ার ঝাঁপি শেষে ভাঙলে।[১৯]

লোক উপাদান — উপন্যাসের বিকল্প স্বর:

তারাশঙ্করের উপন্যাসে যেখানে গোষ্ঠীজীবনের কথা পাই সেখানে তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মিথ চেতনা। তাদের আশা আকাঙ্খা, নীতি ধর্ম সবই নির্ধারিত হয় এই মিথকে কেন্দ্র করে, তাই যেকথা সরাসরি ব্যক্ত থাকে তা তাদের জীবনের সঙ্গে জড়ানো মিথকে পর্যবেক্ষণ করলে পাঠক বুঝতে পারেন। মিথ যেন গোষ্ঠীজীবনের প্রতিনিধিত্ব করে, হয়ে ওঠে তাদের কণ্ঠস্বর। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'তে কাহারদের উপাস্য কত্তাঠাকুর, কেন কোনো পৌরাণিক দেবতা না হয়ে এমন উপদেবতা হলেন যাঁর রূপ অনেকটা ব্রাহ্মণদের মতো — গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ধবধবে পৈতে, পায়ে খড়ম। এ কি কাহারদের উচ্চকুলে জন্মানোর মনোগত বাসনার প্রতিফলন?

'Rabelais and his world' (1965) বইতে বাখতিন কার্নিভাল-এর কথা জানান। ইউরোপীয় লোক সংস্কৃতির বিশেষ উৎসব কার্নিভাল যা খেলা তামাশা আমোদ প্রমোদের সুযোগ করে দেয়। এখানে সব ক্রিয়াকলাপেই অনেকে অংশ নেয়। সামাজিক বৈভব বা সত্তার স্তর উল্টে যায়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে লোক-সাধারণের মধ্যে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ধর্মীয়, ভীতিকে জয় করার উদ্দীপনা দেখা যায় — তাই এক অর্থে কার্নিভাল মানুষের মুক্তির প্রয়াস। সাহিত্যে এই প্রয়াস ঘটলে তা বাখতিনের ভাষায় হয়ে ওঠে কারনিভালাইজেশন। রোমান ক্যাথলিকদের একমাস সংযমের পূর্বের দিন উৎসব ও মেলার আয়োজনের অনুষ্ঠানকে 'কার্নিভাল' বলা হয়। এই আনন্দ অনুষ্ঠানের অবসরে পরিবেশিত গানের মাধ্যমে বহু মানুষের অবদমিত কণ্ঠস্বরের প্রকাশ ঘটে। জনমানসে এই অপ্রকাশিত স্বরের প্রকাশকে Carnivalesque বলা হয়। কোনো উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন, লোকগান, বিভিন্ন লোকবিশ্বাস প্রভৃতি লোক উপাদানগুলি সমাজের নীচু শ্রেণির তথা প্রান্তিক মানুষগুলির মনের গোপনে লুকানো ইচ্ছার, অভিপ্রায়ের প্রকাশ, এই লোক উপাদানগুলিকেই Carnivalesque বা লোক অভিজ্ঞান রূপে চিহ্নিত করতে পারি।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে 'ক্রনোটোপ'গত ধারণা:

উপন্যাসের একটা নিজস্ব কালক্রম চিহ্ন থাকে, থাকে সময়ের চলন। উপন্যাস একই সঙ্গে বিভিন্ন সময়কে ধারণ করে, আবার সেখানে থাকে বিভিন্ন স্থানের গুরুত্ব। বাখতিন একেই 'ক্রনোটপ' বলতে চেয়েছেন। গ্রিক শব্দ chromosএর অর্থ সময় আর topos এর অর্থ স্থান। উপন্যাসে স্থান ও কালের বিশেষ আয়তনকেই বলা যায় ক্রনোটপ। যেমন 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে নানা কালখণ্ডের প্রভাব আছে, তেমনি বিশেষ স্থানিক অবয়ব। এই উপন্যাসের দ্বন্দ্বের মূল সূত্রে আছে স্থান এবং কাল, এর পটভূমি শুধু পরিবার জীবন নয়, ক্ষয়িষ্ণু জমিদার তন্ত্রের রূপ শিবনাথের পরিবারে। এরই বিপরীতে গৌরী যে কালের প্রতিনিধি সেটি ব্যবসায়ী ধনতান্ত্রিক কাল, আবার এই দুই স্তরের দ্বন্দ্বের মধ্যে আর একটি কালক্রম চিহ্ন এসে পড়ে — অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কাল, যেখানে শিবনাথ ঔপনিবেশিকবাদে পীড়িত জাতির প্রতিনিধি হয়ে, জাতির মুক্তির প্রয়াসী হয়। বাখতিন লিখেছেন "both author and reader inhabit their own chronotope (forms of Time and Chronotope in the novel, page-253) লেখক সময়ের চাহিদা অনুসারে অতীতকালকে তাঁর সময়ের চাহিদা অনুসারে নতুন প্রেক্ষিতে স্থাপন করেন। পাঠক সেই কালক্রমকে নিজস্ব সময়ের চাহিদা অনুযায়ী

উপলব্ধি করেন। যেমন 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মতোই মন্বন্তর পরিস্থিতির বর্ণনা আছে। বন্দেমাতরম্ সংগীতের প্রয়োগ আছে।

উপসংহার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যে তথাকথিত শিথিল বা দুর্বল কাঠামোর সমালোচনা একসময় করা হয়েছিল, তার ভিত্তি ছিল মূলত প্রচলিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের মানদণ্ড। কিন্তু এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয় যে, তারাশঙ্করের শিল্পসিদ্ধি আসলে তাঁর নিজস্ব দেশজ শৈলীর অনুসন্ধানে নিহিত, যা কোনো পূর্ব-নির্ধারিত ছাঁচে না ফেলে জীবনের গভীর সংবেদন ও বাস্তবতাকে সরাসরি তুলে ধরে। মিখাইল বাখতিনের বহুস্বরিকতা (Polyphony) হেটেরোগ্লোসিয়া (Heteroglossia) তত্ত্বের আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, তাঁর উপন্যাসে লেখক কেবল একজন একক কণ্ঠস্বর নন, বরং চরিত্রগুলো তাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে নিজস্ব বয়ান বা জবানিতে কথা বলে ওঠে।

উপন্যাসের অবয়বে উপভাষা, লোকগান, প্রবাদ-প্রবচন এবং মিথের প্রয়োগ কেবল অলংকরণ নয়, বরং তা এক একটি স্বতন্ত্র 'স্বর' হিসেবে কাজ করে যা আখ্যানকে এক বিকল্প বয়ান বা কার্নিভালের (Carnival) রূপ দেয়। তারাশঙ্করের উপন্যাসের 'ক্রনোটপ' বা স্থান-কালের সার্থক বিন্যাস গ্রামীণ সমাজের ভাঙাগড়া এবং বিবর্তনের ইতিহাসকে অত্যন্ত নিপুণভাবে জীবন্ত করে তুলেছে। পরিশেষে বলা যায়, পাশ্চাত্য রীতির অনুপস্থিতি তারাশঙ্করের উপন্যাসের শিল্পগত ত্রুটি নয়, বরং তা তাঁর নিজস্ব আখ্যান-শৈলীর স্বাতন্ত্র্য এবং প্রাকৃত জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধেরই সার্থক পরিচয় বহন করে। তাঁর উপন্যাসের এই বিশদ কাঠামো আধুনিক পাঠকের কাছে এক নতুন ও ভিন্নতর জীবনোপলব্ধি নিয়ে আসে।

তথ্যসূত্র:

১। 'An Acre of Green Grass', Buddhadeva Basu, Orient Language Ltd., 1948, P. 83
২। ওই
৩। 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক', ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, করুণা প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ৫৪৩-৫৪৪ দ্র.
৪। 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা', পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯,পৃ. ৩৪৩
৫। 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক', ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, করুণা প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ৫২৫
৬। 'বৈশাখী পত্রিকা — তারাশঙ্কর বিশেষ সংখ্যা', ২০১৪, ১৪ ডিসেম্বর, পৃ. ৯৯
৭। 'আমার সাহিত্য জীবন', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ১৭
৮। 'আখ্যান ও সমাজ —তারাশঙ্কর', প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, জানুআরি ২০১৪, পৃ. ১০৪
৯। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৩৫৫, পৃ. ৫
১০। ওই, প. ১২
১১। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, পৃ. ১
১২। ওই, পৃ. ১৫
১৩। 'গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস', মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯, পৃ. ১২২
১৪। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, পৃ. ১৯১
১৫। 'গণদেবতা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র এন্ড ঘোষ, ১৩৮৪, পৃ. ১৫১
১৬। ওই
১৭। 'তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে', প্রকাশ ১৯৭১, পৃ. ৩৫৩
১৮। ওই, পৃ. ৩৬২
১৯। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, পৃ.৩১১

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি

© Santiniketan Sahityapath

১। অচিন্ত্য বিশ্বাস, 'মিখাইল বাখতিন উপন্যাস তত্ত্ব', প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০১৪
২। অঞ্জন সেন, উদয় নারায়ণ সিংহ সম্পাদিত, 'উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ১৫ অগস্ট ২০০৪

৩। গোপীচান্দ নারঙ, 'গঠনবাদ', উত্তর গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৯
৪। তপোধীর ভট্টাচার্য, 'বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ', প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৬
৫। তপোধীর ভট্টাচার্য, 'বাখতিন', এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০৫, জুন ২০০২
৬। তুষার পটুয়া, 'প্রকরণের আলোকে তারাশঙ্করের গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬
৭। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার সাহিত্য জীবন', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭
৮। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার কালের কথা', মিত্র ও ঘোষ, ২০০৬
৯। দেবেশ রায়, 'উপন্যাস নিয়ে', দে'জ, ১৯৯১
১০। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পোস্টমডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য', রাডিক্যাল ইম্প্রেশন কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ১৯৯৭
১১। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, 'আখ্যান ও সমাজ — তারাশঙ্কর', জানুআরি ২০১৪
১২। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯
১৩। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'উপন্যাসের যৎকিঞ্চিৎ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০
১৪। রণবীর লাহিড়ী, 'আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান', চর্চাপদ, প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১১

পত্রপত্রিকা

১। এবং এই সময় (বাখতিন সংখ্যা) পত্রিকা, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৯৬, ৯ জুন
২। মিখাইল বাখতিন স্মরণ সংখ্যা ও একগুচ্ছ গল্প, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৭, ২০ জুন
৩। বৈশাখী পত্রিকা — তারাশঙ্কর বিশেষ সংখ্যা, ২০১৪, ১৪ ডিসেম্বর

ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি

1.Bakhtin, M.M. The Dialogic Imagination: Four Essays (trans. C. Emerson and M. Holquist. ed. M. Holquist) Austin. Tex: University of Texas Press.1981
2.Bakhtin, M.M. Problems of Dostoevsky's Poetics. (trans. And ed. C. Emerson). Minneapolis, London. University of Minnesota Press. 1984
3.Bakhtin, M.M. Rabelais and His World (trans. H. Iswolsky). Bloomington. Ind: Indiana University press. 1984

—

© Santiniketan Sahityapath